প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তি শিক্ষা প্রশাসনের নিয়মিত কাজ হলেও সময়মতো তা হয় না বলে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়। একদিকে একসঙ্গে অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের চাপ থাকে, সময়ে সময়ে শিক্ষকরা এমপিওভুক্তির দাবিতে মাঠে নেমে আসেন; আবার নির্দিষ্ট বয়স পার হওয়ায় অনেক শিক্ষকও এমপিওবঞ্চিত হোন। সর্বশেষ ২০১৯ সালের অক্টোবরে সাত বছর পর আড়াই হাজারের অধিক প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হয়। তখন ২০১৮ সালের এমপিও নীতিমালা ও জনবল কাঠামো অনুসরণ করা হলেও শিক্ষার্থী বাড়ানোসহ কিছু শর্ত যোগ-বিয়োগ করে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য নতুন নীতিমালা আসছে বলে মঙ্গলবারের সমকালে একটি প্রতিবেদনে প্রকাশ। এ নীতিমালায় যেমন কিছু শর্ত শিথিল হয়েছে, তেমনি কঠোরও হয়েছে। আবার দীর্ঘদিনের দাবি সত্ত্বেও দেশের বেসরকারি কলেজগুলোর অনার্স ও মাস্টার্স পাঠদানকারী শিক্ষকদের এমপিওভুক্তি অধরাই থাকছে। শিক্ষা প্রশাসনকে তাদের বিষয়টি পুনরায় বিবেচনার আহ্বান জানাই। আমরা জানি, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানই বেসরকারি। সেখানে অন্তত শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন সরকারিভাবে নিশ্চিত করার ওপর আমরা গুরুত্ব আরোপ করতে চাই। এ জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো সরকারের বেঁধে দেওয়া শর্তাবলি মানবে বলে আমাদের প্রত্যাশা। তবে শর্ত অবশ্যই যৌক্তিক হওয়া চাই। বস্তুত একাডেমিক স্বীকৃতি, শিক্ষার্থী সংখ্যা, পরীক্ষার্থী ও উত্তীর্ণের সংখ্যার আলোকেই একটি প্রতিষ্ঠানকে এমপিওর জন্য মনোনীত করা হয়। নীতিমালা চূড়ান্ত করতে পাসের হারের শর্তে ছাড় দেওয়া কিংবা স্বীকৃতির শর্ত তুলে দেওয়ার চিন্তা আমরা ইতিবাচক হিসেবেই দেখছি। কিন্তু শিক্ষার্থী সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়ার শর্ত অনেক প্রতিষ্ঠানের জন্যই কঠিন হয়ে যাবে বলে আমরা মনে করি। বিশেষ করে মফস্বল এলাকার প্রতিষ্ঠানগুলোর বেশি সমস্যা হবে। নীতিমালা অনুযায়ী, আগে মফস্বলে যেখানে উচ্চ মাধ্যমিক কলেজে দেড়শ শিক্ষার্থী থাকলেই হতো, এখন সেখানে প্রায় আড়াইশ করলে এত বেশি শিক্ষার্থী খুঁজে পাওয়া কষ্টকর হবে। ফলে প্রতিষ্ঠানগুলো যদি শিক্ষার্থীই না পায়, তাহলে পাসের হার কমবেশি করার সুফল তেমন একটা আসবে না। স্বাভাবিকভাবেই এতে নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তি আগের চেয়ে কঠিন হবে। সরকার যদি শর্ত সহজ করার কথা বলে কঠিন করে, তা হিতে বিপরীত হতে পারে। আমরা চাই, নীতিমালা চূড়ান্ত করার আগে শিক্ষার্থী সংখ্যার বিষয়টি আবার বিবেচনা করা উচিত। আমরা জানি, এমপিওভুক্ত নয়, বেসরকারি এমন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমনিতেই নানা অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ নিয়ে টিকে আছে। তার ওপর চলমান করোনা-দুর্যোগ এদের অনেকের জন্যই মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা হিসেবে আবির্ভূত। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন বন্ধ থাকায় অনেক প্রতিষ্ঠান যেমন শিক্ষার্থী ধরে রাখতে পারেনি, অনেক প্রতিষ্ঠান হয়তো তাদের শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন-ভাতী সেভাবে দিতে পারেনি। একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে একজন শিক্ষককে কতটা ত্যাগ স্বীকার করতে হয়, তা আমাদের অজানা নয়। মেধা, পরিশ্রম ও সময় দেওয়ার পরও যখন কেউ তার পারিশ্রমিক না পান কিংবা পরিশ্রম অনুযায়ী বা চাহিদার তুলনায় সামান্য পান, তাতে একজন শিক্ষকের পরিবার চালানোই দায়। এমপিওভুক্তিই সেখানে শিক্ষকদের মুখে হাসি ফোটাতে পারে। আমরা দেখছি- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সরকারি, কিছু এমপিওভুক্ত আর বাকিগুলো রেজিস্টার্ড ও নন-এমপিওভুক্ত হলেও সবাই অভিন্ন শিক্ষা কার্যক্রম অনুসরণ করলেও সবার সমান সুযোগ-সুবিধা নেই। সমান সুযোগ দাবি করা তাদের অন্যায্য নয়। সে ক্ষেত্রে প্রশাসন যথাসম্ভব অধিক সংখ্যক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওর আওতায় আনবে বলে আমরা প্রত্যাশা করি। শিক্ষা খাতে বাজেট বাড়িয়ে হলেও তা নিশ্চিত করা চাই। একই সঙ্গে আমরা বিশ্বাস করি, সব শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে পাঠদানসহ তার ওপর অর্পিত সব দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে সচেষ্ট হবেন। আমরা মনে করি, শিক্ষক-শিক্ষার্থী তৎপর হলে পরীক্ষায় অকৃতকার্য শিক্ষার্থীর হার যেমন কমে আসবে, তেমনি নিশ্চিত হবে শিক্ষার মানও। সে লক্ষ্যে প্রশাসনে এমপিওভুক্তির নীতিমালা যথার্থ অর্থে সহজ করাই মঙ্গল।